প্রাণের প্রকাশ ও পরবর্তী জৈব বিবর্তনে আয়নীকারক বিকিরণ

স্বপন শীল

প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা বসুন্ধরা। সবুজের সমারোহ, আর বাঙ্ময় কলতান— মহাকাশে মানুষের দৃষ্টি যতদূর পৌঁছেছে তার মধ্যে এখনও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভাইরাস থেকে এককোষী, এককোষী থেকে বহুকোষী এবং বহুকোষীর শুরু থেকে মানুষ পর্যন্ত অসংখ্য জীব প্রজাতির উপস্থিতিতে পৃথিবীর উপরিভাগ সদা মুখরিত। স্বীকার করতেই হবে, এদের মধ্যে একমাত্র মানুষ-প্রজাতিই প্রকৃতি-নির্ভর অভিযোজনে বাঁধা জীবনযাত্রা থেকে বেরিয়ে এসে স্পর্ধা দেখিয়েছে সচেতন প্রয়াসের জোরে প্রকৃতি-পরিবেশকে নিজের অনুকূলে বদলে দেবার। তবে প্রজাতি হিসাবে আবির্ভাবের সূচনাতেই মানুষ এসব করতে পারেনি। বরং তখন মানুষের বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া অন্যান্য প্রাণীদের থেকে কিছুমাত্র পৃথক ছিল না। এরপর সে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলার ব্যবস্থাগুলি ক্রমে রপ্ত করতে শুরু করল। এই পথ ধরেই একসময় ক্রমশ তৈরী হতে শুরু করল সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা যার অনিবার্য পরিণতি মানুষের সমাজবদ্ধ হয়ে ওঠা।

সমাজবদ্ধ হয়ে ওঠার অন্যতম শর্ত সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা হলেও সমাজকে টিকিয়ে ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি সে সময়ে ছিল আরও জটিল। ন্যূনতম মাত্রায় সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা বিকশিত হতেই অসংখ্য প্রশ্ন মানুষের চিন্তার জগৎকে আচ্ছন্ন করে তুলল। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রশ্নটি ছিল— কোথা থেকে এল এই প্রাণের সমারোহ, কেনই বা গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, নীহারিকা সহ এই মহাকাশ। সে সময়ে মানুষের সচেতন প্রয়াসের স্তর যে সুরে বাঁধা ছিল তাতে এ প্রশ্নের উত্তর মেলানো একেবারেই সম্ভব ছিলনা। কিন্তু সে সময়ের সামাজিক মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর ছিল তার কাছে অত্যন্ত জরুরী। এই পথ ধরেই একসময় সৃষ্টিতত্ত্ব বা creationism এর প্রবর্তন ঘটেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে ইতর বিশেষ পার্থক্য থাকলেও মূল সুর একই। কোন এক অতিপ্রাকৃতিক উপায়ে গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা ইত্যাদি সহ মহাকাশ এবং মহাকাশের মধ্যে পৃথিবী গ্রহে জীবপ্রজাতির আবির্ভাব ঘটেছে এবং এরা প্রত্যেকেই অপরিবর্তনীয়। তিনশো বছর আগেও সৃষ্টিতত্ত্বের এই ধারণাগুলির সামনে কোন চ্যালেঞ্জ ছিল না। সম্ভবত নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রই অপরিবর্তনীয় মহাবিশ্ব (constant world)-এর ধারণার সামনে প্রথম চ্যালেঞ্জ। এরপর একের পর এক

আবিষ্কার তথা সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ মানুষের সচেতন প্রয়াসের স্তরকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছে যে কোন প্রশ্ন বা সমস্যার তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক সমাধান না পাওয়া গেলেও সেই সঠিক সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে সচেষ্ট থাকতে কোন একক মানুষ বা তার সমাজের আর কোন মানসিক সমস্যা থাকে না। এই সামাজিক পটভূমির নিরিখে ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের পর সৃষ্টিতত্ত্ব সমস্ত দিক থেকেই খুব দ্রুত ভেঙে পড়তে শুরু করে। বৈচিত্র্যময় জীবজগৎকে কেন্দ্র করে সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণা প্রথম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে ল্যামার্ক, ডারউইন, আলফ্রেড ওয়ালেসদের হাতে। এরপর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার এবং জৈব রসায়ন, প্রাণ রসায়ণ, প্রাণ পদার্থবিদ্যা, জিন বিদ্যা ও অণুজীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলির ব্যাপক বিকাশ আজ এটা নিশ্চিত করেছে যে পৃথিবীর উপর প্রাণের উন্মেষ ও তার বিবর্তন বস্তুজগতের পরিবর্তন তথা বিবর্তনের এক অনিবার্য পরিণতি। পৃথিবী ছাড়া মহাকাশের যে কোন গাগনিক সংগঠনে যদি পৃথিবীতে উপস্থিত বস্তুগত শর্তাবলী থেকে থাকে বা ভবিষ্যতে কখনও তৈরী হয় তাহলে সেখানেও এই পরিণতি সম্ভব।

প্রাণ ও জড়

জড় বস্তু থেকে প্রাণ-পদার্থের পার্থক্য নির্ধারণের চেষ্টা এযাবৎ অনেক হয়েছে। এদের মধ্যে গ্রবস্টেইনের (Grobstein, 1965) প্রচেষ্টা বিজ্ঞানী মহলে বিশেষভাবে স্বীকৃত এবং গ্রহণযোগ্যও বটে। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে প্রাণকে ব্যাখ্যা করা যায়— "Macromolecular, hierarchically organized and characterized by replication, metabolic turn over and a regulation of its energy flow which is more or less independent of its surroundings."[1]

উপরোক্ত সংজ্ঞাটি প্রতিটি জীব প্রজাতির পক্ষে প্রযোজ্য। DNA বা RNA অণু দিয়ে গঠিত ভাইরাসকেও যেমন এই সংজ্ঞার দ্বারা পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, বহুকোষী মানুষকেও একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। পাশাপাশি এই সংজ্ঞা থেকে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট যে নিজের প্রতিরূপ গঠনের জন্য বিভাজনক্ষম উপাদান এবং বিপাক প্রক্রিয়া চালানোর জন্য উপাদান প্রতিটি জীব প্রজাতির কাছেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিরূপ গঠনে ও বিপাক প্রক্রিয়াতে বেশ কিছু জটিল প্রাণ রাসায়নিক যৌগ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এগুলি সব জৈব প্রজাতিতেই সাধারণ (common)। এদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড, ডিঅক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড (DNA) এবং রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড (RNA)। সংক্ষেপে এই তিনটির নাম করলেও এদের সহায়ক সংগঠক (precursor) হিসাবে আরও অসংখ্য জৈব যৌগ রয়েছে। চূড়ান্ত অর্থে এসব যৌগগুলি অবশ্যই অজৈব অবস্থান থেকে এসেছে এবং এই প্রক্রিয়াটি পৃথিবীর উপরেই ঘটেছে। এক সময় জে. ডি. বার্নাল (1961) এই প্রক্রিয়ার নামকরণ করেছিলেন 'Biopoesis'। যদিও এই প্রসঙ্গে 'Biogenesis' শব্দটিই বহুল প্রচলিত। কক্ষপথে গ্রহ হিসেবে পৃথিবীর আবির্ভাবের পর প্রায় দেড়শ

কোটি বছর ধরে চলে এক রাসায়নিক বিবর্তনের (chemical evolution) পালা, যার শেষ দিকে ঘটেছিল এই biogenesis।

পৃথিবীতে বিরানব্বইটি স্বাভাবিক মৌলের অস্তিত্ব রয়েছে। এর মধ্যে 35/40 টি মৌল পদার্থ প্রাণের বিকাশ ও বিবর্তনে অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে আবার কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও ফসফরাস— এই পাঁচটি মৌল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অবশিষ্টের কিছু মাঝারি গুরুত্বের এবং আরও কিছু রয়েছে যাদের অংশগ্রহণ খুবই অল্প পরিসরে। এই মৌলগুলি পৃথিবীর উপরে খুব কমই মৌল হিসাবে অবস্থান করত এবং একেবারে শুরু থেকেই যে সবগুলি পৃথিবীর উপরে অবস্থান করত তাও নয়। পৃথিবীর আবির্ভাবের পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যৌগে (অজৈব) এই মৌলগুলির সমাবেশ ঘটেছে। এই সমাবেশ ঘটাটাও রাসায়নিক বিবর্তনের একটা অঙ্গ।

রাসায়নিক বিবর্তনের শেষ পর্যায়ে প্রাণের বিকাশের সূচনা। প্রাণের বিকাশকে প্রথম কোথা থেকে ধরা হবে এ বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও একটি বিষয়ে সবাই নিশ্চিত যে জড় এবং প্রাণের মধ্যবর্তী দশা হিসাবে, অর্থাৎ যার মধ্যে জড় এবং প্রাণ উভয়েরই বৈশিষ্ট্য রয়েছে এরকম জটিল যৌগের বিকাশ ঘটেছে সর্বপ্রথম। এই যৌগ প্রধানত DNA ও RNA, যাদের থেকে ক্রমান্বয়ে ভাইরাস, ব্যাক্টিরিয়া, প্রোক্যারিওটিক[২] কোষ, ইউক্যারিওটিক[৩] কোষ ও বহুকোষীয় জীবনের বিবর্তন। বলা বাহুল্য, ভাইরাস সর্বাপেক্ষা সরল প্রাণপদার্থ যা প্রধানত DNA বা RNA অণু দ্বারা গঠিত।

প্রাণের বিকাশ ও বিবর্তন নিরবচ্ছিন্ন হলেও দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সম্পূর্ণ অজৈব পরিবেশে ধাপে ধাপে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে, কিন্তু প্রাণের বিকাশ ঘটার পর তার বিবর্তনের উপর অজৈব পরিবেশের প্রভাব থাকলেও তা মূল নিয়ন্ত্রক ছিল না। বিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন সংশ্লেষণ (synthesis) প্রাণ পদার্থের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে তার অভ্যন্তরেই ঘটত। অবশ্যই এর জন্য প্রয়োজনীয় অজৈব পদার্থ সে সুযোগ এবং লভ্যতা (availability) অনুযায়ী পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করত।

কিন্তু পরিবর্তন বা বিবর্তন যাই হোক্ না কেন, কোন রকম শক্তি বা বলের প্রভাব ছাড়া কোন কিছুই সম্ভব নয়। রাসায়নিক বিবর্তন, প্রাণের বিকাশ ও প্রাণের বিবর্তনও এর বাইরে নয়। গবেষণাগারে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে শক্তির যে বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে তাদের মধ্যে আয়নীকারক বিকিরণের (ionizing radiation) ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আয়নীকারক বিকিরণ ও পদার্থের পরিবর্তন:

আয়নীকারক— এই শব্দটা থেকেই এর অর্থ পরিষ্কার। যে বিকিরণ আয়ন তৈরী করতে পারে, তাকে আয়নীকারক বিকিরণ বলে। কেননা, যে কোন বিকিরণ আয়ন তৈরী করতে পারে না এবং আয়নের বৈশিষ্ট্য থেকেই আয়নীকারক বিকিরণের ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ হবে।

পরমাণুর তড়িতাহিত অবস্থাকে আয়ন বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় যে কোন পরমাণুর মধ্যে ইলেক্ট্রন বা ঋণাত্মক তড়িৎ কণা এবং প্রোটন বা ধনাত্মক তড়িৎ কণার সংখ্যা ও তড়িতের মান সমান থাকার জন্য পরমাণুটি নিস্তড়িৎ বা তড়িৎ নিরপেক্ষ হয়। কিন্তু কোনক্রমে ইলেক্টন ও প্রোটন সংখ্যার হেরফের ঘটলেই পরমাণুটি তড়িতাহিত হয় এবং তখন তাকে আয়ন বলে। কোন পরমাণুর ইলেক্ট্রনের সংখ্যা কমে বা প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে গেলে পরমাণুর ধনাত্মক তড়িতাধান বৃদ্ধি পায় এবং তখন পরমাণুটি ধনাত্মক বা ক্যাটায়নে পরিণত হয়। বিপরীতে কোন পরমাণুর ইলেক্ট্রনের সংখ্যা বেড়ে গেলে বা প্রোটনের সংখ্যা কমে গেলে পরমাণুটির ঋণাত্মক তড়িতাধান বৃদ্ধি পায় এবং তখন পরমাণুটি ঋণাত্মক বা অ্যানায়নে পরিণত হয়। প্রোটন পরমাণুর কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াসে অবস্থান করার ফলে প্রোটনের সংখ্যা কমানো বা বৃদ্ধি করার সুযোগ নেই বললেই চলে। সেজন্য আয়ন তৈরীর প্রক্রিয়া নির্ভর করে পরমাণুর সাথে ইলেকট্রন সংযোজন বা পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বিয়োজনের উপর।

ইলেকট্রন পরমাণুর কেন্দ্রকের চারপাশে বিভিন্ন কক্ষপথে স্থির তড়িৎ বলের আকর্ষণে আবর্তন করে। এই বলের উৎস স্থল পরমাণুর কেন্দ্রক। অতএব একটা ইলেকট্রনের উপর কেন্দ্রক যতটুকু বল প্রয়োগ করে তাকে নিজের চারপাশে আটকে রেখে ঘোরায় তার চাইতে একটু বেশী বল যদি বাইরে থেকে ইলেকট্রনের উপর প্রয়োগ করা যায় তাহলে পরমাণু থেকে ইলেকট্রনকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। বাইরে থেকে কীভাবে বল প্রয়োগ করা যেতে পারে? হাতুড়ি মেরে, ঘোড়া জুড়ে বা মোটর জুড়ে এই বল প্রয়োগ সম্ভব নয়। এই সব বলের মান অনেক বেশী হলেও এরা পরমাণুর ইলেকট্রন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, বরং পরমাণুর উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই বলকে এমন ক্ষুদ্র মাপের হতে হবে যা পরমাণুর মধ্যে ঢুকে ইলেকট্রনকে স্পর্শ বা আঘাত করতে পারে। এরকম ক্ষুদ্র মাপের বল একমাত্র আলোক কণার বিকিরণই যোগান দিতে পারে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিচারে অসংখ্য রকম বিকিরণ হতে পারে। যে কোন তরঙ্গের বিকিরণ দিয়ে একাজ হবে না। একটা পরমাণুর ব্যাস 10^{-8}cm বা $1A^{0}$ । অতএব পরমাণুর মধ্যে ঢুকতে হলে আলোক কণার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 10^{-7}cm হলে চলবে না অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে অবশ্যই 10^{-8}cm এর সরল গুণিতক হতে হবে। এ ধরণের আলোক কণার বিকিরণকেই আয়নীকারক বিকিরণ বলে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আয়নীকারক বিকিরণ হল অতি বেগুনী রশ্মি, X-রশ্মি ও গামা রশ্মি এবং এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পাল্লা যথাক্রমে $4x10^{-5}$cm থেকে $6x10^{-8}$cm, 10^{-6}cm থেকে 10^{-10}cm এবং 10^{-8}cm থেকে 10^{-12}cm। বলা বাহুল্য, এই তিনটি রশ্মির মধ্যে আয়নীকারক বিকিরণ হিসাবে গামা রশ্মি সবচাইতে শক্তিশালী।

প্রাণের প্রকাশে আয়নীকারক বিকিরণের ভূমিকা

পৃথিবীতে এক সময় অজৈব পরিবেশে অজৈব সংশ্লেষণের মধ্য দিয়েই যে জৈব পদার্থের বিকাশ ঘটে থাকতে পারে বা ঘটেছিল তা প্রথম ধরা পড়ে মিলারের (S.L.Miller, 1959) পরীক্ষায়।

মিলার তাঁর পরীক্ষার জন্য বেশ সরল জিনিষ-পত্র ব্যবহার করেছিলেন। একটি তড়িৎমোক্ষণ ফ্লাস্কে (Sparkdischarge Flask) সম্পূর্ণ অক্সিজেনহীন অবস্থায় জল, হাইড্রোজেন, মিথেন ও অ্যামোনিয়া নিয়ে তার মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে 175 ঘন্টা ধরে তড়িৎ প্রবাহ পাঠালেন। এর ফলে ফ্লাস্কের উপরদিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে তড়িৎমোক্ষণ ঘটতে লাগল। ফ্লাস্কের মধ্যে গ্যাসসমূহ ও জলের মিশ্রণ যাতে সব সময় প্রবহমান থাকে তার জন্য নীচের দিকের জলকে সর্বদা ফুটন্ত রাখার ব্যবস্থাও তিনি করলেন। প্রথম 25 ঘন্টা পর দেখা গেল হাইড্রোজেন সায়ানাইড ও অ্যালডিহাইড নামে দু'টি যৌগ নীচের দিকে তৈরী হয়েছে। এর পর 125 ঘন্টা ধরে ফ্লাস্কের উপর দিকে বিভিন্ন অ্যামাইনো এসিড তৈরী হোল।

প্রাণের উৎস নিয়ে যে সব বিজ্ঞানীরা ভাবনা চিন্তা করছিলেন তাদের মধ্যে মিলারের এই পরীক্ষা দারুণভাবে আশার সঞ্চার করল। এক বছরের মধ্যেই, অর্থাৎ 1960 সালে উইলসন (Wilson) মিলারকে অনুসরণ করে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি মিশ্রণের মধ্যে সালফার যোগ করে আরও জটিল যৌগ পেলেন যেগুলি 20 অথবা তার চাইতে বেশী কার্বন পরমাণু দিয়ে তৈরী পলিমার (polymer) জাতীয় অণু।

মিলার তাঁর পরীক্ষাকে কার্যকরী করার জন্য যে পরিবেশ গবেষণাগারে তৈরী করেছিলেন তার সাথে আদিম পৃথিবীর পরিবেশের যথেষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। বর্তমানে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে যে সব মৌল বা যৌগ গ্যাসের প্রাধান্য তাদের অস্তিত্ব আদিম পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ছিল না। প্রথম প্রায় অর্ধ বিলিয়ন বছর জুড়ে মিথেন, অ্যামোনিয়া ও নাইট্রোজেন গ্যাস পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে শাসন করত। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন ছিল প্রায় বিরল। পৃথিবীর উপরিতলে সমুদ্র সৃষ্টি হওয়ায় জল ছিল এবং ওজোনস্তরের অস্তিত্ব না থাকায় সূর্য এবং মহাজাগতিক অন্যান্য উৎস থেকে আসা অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের সামনে ভুপৃষ্ঠ ছিল পুরোপুরি উন্মুক্ত। এই পথে আসা অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে জলের বিশ্লেষণে কিছুটা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন্ন হত বটে কিন্তু, অত্যন্ত সক্রিয় হওয়ায় অক্সিজেনের মুক্ত অস্তিত্ব সম্ভব হত না।

মিলারের পরীক্ষায় ব্যবহৃত গ্যাসগুলি ছিল পৃথিবীর আদিম বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে নিশ্চিতই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু, তড়িৎমোক্ষণ কেন? পরীক্ষার কিছু সুবিধার জন্য এবং বিক্রিয়ার শক্তি যোগানোর জন্য সেই সময় তড়িৎমোক্ষণ ব্যবহার করলেও মিলারের জানাই ছিল অতিবেগুনী রশ্মি ব্যবহারেও একইরকম ফল আসতে পারে। পরবর্তীকালে মার্কিন বৈজ্ঞানিক পোন্নামপেরুমা (Ponnamperuma) তড়িৎমোক্ষণের বদলে অতিবেগুনী রশ্মির সাহায্যেই মিলারের পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করেন ও আরো বৃহৎ পরিসরে পরীক্ষাটি বিস্তৃত করেন। তিনি প্রথমে নিউক্লিক অ্যাসিডের জন্য প্রয়োজনীয় পিউরাইন ক্ষারসমূহ ও অ্যামাইনো অ্যাসিড পেলেন এবং পরে বিভিন্ন শর্তাধীনে এইসব যৌগগুলির সংযুক্তি ঘটাতে সক্ষম হন। উদাহরণ হিসাবে হাইড্রোজেন সায়ানাইডের উপস্থিতিতে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পলিমার গঠন (polymerization) বা ফসফরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের নিউক্লিওটাইড গঠন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সমসাময়িককালে অরো (Oro, 1965) কেলভিন (Calvin, 1965) ওপারিন (Oparin, 1965) রোবিনউইট্জ্ (Robinowitz, 1968) এবং আরো বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। আদিম পৃথিবীতে জড়বস্তু থেকে ধাপে ধাপে কীভাবে প্রথম প্রাণের প্রকাশ ঘটেছিল সেই রহস্য উন্মোচনে এঁদের প্রত্যেকের গবেষণা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এইসব গবেষণা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে সে সময় যদি পৃথিবীর ওপর পর্যাপ্ত পরিমাণে অতিবেগুনী বিকিরণের অস্তিত্ব না থাকত তাহলে প্রাণের প্রকাশ হয়ত সম্ভব হত না; বা অতিবেগুনী বিকিরণের মত অপর কোন আয়নীকারক বিকিরণের জন্য প্রাণের প্রকাশকে অপেক্ষা করতে হত।

অতএব যে সময়ে পৃথিবীর উপরিভাগে প্রাণের প্রকাশ ঘটেছিল সেই সময়ে পৃথিবীর অবস্থাটা কেমন ছিল বা তার উপর আয়নীকারক বিকিরণের প্রভাব কেমন ছিল তার অনুসন্ধান প্রয়োজন। ভূতত্ত্ববিদ্দের গবেষণা ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রায় ৫০০ কোটি বছর পূর্বে মহাকাশের কোথাও কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবী সূর্যের চারপাশের এই কক্ষপথে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। পৃথিবী তার শৈশবে ছিল অস্থির ও চঞ্চল। প্রথম ১৫০ কোটি বছর এক জটিল সর্বব্যাপী রাসায়নিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার এগিয়ে যাওয়া। এটাই ছিল স্বাভাবিক। শিশু পৃথিবীর গঠন, আকৃতি ও আয়তন অবশ্যই আজকের পৃথিবীর মত ছিল না। একসময় ভূতত্ত্ববিদ্দের ধারণায় বহুদূর থেকে ছিট্‌কে আসা পৃথিবীটা ছিল গলিত বস্তুর আধার। এরকম ধারণার পক্ষে কোন উপযুক্ত যুক্তি খুঁজে না পাওয়ায় তা বাতিল হয়েছে। শুরুতে পৃথিবীটা কঠিনই ছিল। তবে আজকের মত ঘনত্ববিশিষ্ট আঁটসাঁট ছিলনা। গঠনগত শিলারাশিগুলি ছিল বেশ আল্‌গা, গড় ঘনত্ব ছিল বেশ কম; যে কারণে আজকের তুলনায় তখনকার পৃথিবীর আয়তন ছিল অপেক্ষাকৃত বড়। আহ্নিক গতির কারণে; অর্থাৎ নিজের অক্ষের চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ পৃথিবীর আয়তন হ্রাস পেতে শুরু করে। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে (core) কঠিন ও ভারী বস্তুগুলি জমা হোল। এই অংশের ব্যাসার্ধ 3471 কি:মি: এবং এখানকার ঘনত্ব 10.7, এরপর অপেক্ষাকৃত কম ভারী বস্তু দিয়ে পরের স্তর অর্থাৎ ম্যান্টেল (mantle) তৈরী। এর ঘনত্ব 4.5। শেষের স্তরটি পূর্বের দুটি স্তর অপেক্ষা আল্‌গা শিলা দিয়ে তৈরী। এই স্তরটির ঘনত্ব 2.8 এবং বেধ 30 কি:মি: অর্থাৎ ভূ-ত্বকের উপর 30 কি:মি: গভীর একটি গর্ত করলেই ম্যান্টেলে পৌঁছানো যাবে। এই সর্বশেষ স্তরকে বলা হয় ভূত্বক (crust)। যাই হোক, এরকম একটি গঠনগত বৈশিষ্ট্য অর্জনের পর পৃথিবীর আয়তনের আর কোন পরিবর্তন পরবর্তীকালে হয়নি। আমাদের আলোচ্য বিষয় ক্রাষ্ট। প্রথমদিকে ক্রাষ্টে হাল্‌কা পদার্থের পরিমাণ যথেষ্ট বেশী ছিল। কিছু কিছু পদার্থ গলিত অবস্থায়ও ছিল। গ্যাসীয় পদার্থগুলি প্রচন্ড চাপে গলিত পদার্থসমূহের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় ছিল।

শুরুতে পৃথিবীর উপর কোন বায়ুমণ্ডল ছিল না। সৌর ও অন্যান্য মহাজাগতিক বিকিরণের কাছে পৃথিবীর উপরিভাগ ছিল উন্মুক্ত। আপতিত বিকিরণ ভূত্বক দ্বারা যে হারে শোষিত হত সেই হারে ভূত্বক থেকে নির্গত হতে পারত না। এর একটা বড় কারণ তখন পৃথিবীর উপর আজকের মত জলমণ্ডল ছিল না। জল যেমন দ্রুত তাপ শোষণ করতে পারে তেমনি দ্রুত

তাপ ছাড়তেও পারে। অতএব আজকের পৃথিবীতে এই সমস্যাটা খুবই কম। ভূত্বক দ্বারা শোষিত তাপ ক্রাষ্ট অঞ্চলের গলনকে ক্রমশ ত্বরান্বিত করতে শুরু করলে এর ফল স্বরূপ ক্রাষ্ট অঞ্চলের অভ্যন্তরস্থ চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময় এই চাপ ভূ-ত্বক উৎসারিত নিম্নচাপ অতিক্রম করে যেতেই আগ্নেয় বিদারণ পর্ব শুরু হয়। দীর্ঘকাল ধরে ঘন ঘন আগ্নেয় বিদারণের ফলে ক্রাষ্ট অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণে গ্যাসীয় পদার্থ সহ গলিত পদার্থ ভূ-ত্বক ভেদ করে পৃথিবীর উপরিভাগে বেরিয়ে আসে। গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জলীয়বাষ্প, নাইট্রোজেন, মিথেন, অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাই অক্সাইড। ভূ-ত্বকের উপর বিক্রিয়ক হিসেবে চাহিদা থাকায় কার্বন ডাই অক্সাইড প্রথম পর্বে বায়ুমণ্ডলে বেশী জায়গা করে নিতে পারেনি। জলীয়বাষ্প ক্রমশ তাপ হারিয়ে তরল রূপে (জল) ভূ-ত্বকের উপর নীচু জায়গাগুলোতে জমা হতে শুরু করে। আজকের জলমণ্ডলের শুরু একদা এভাবেই হয়েছিল। পাশাপাশি বায়ুমণ্ডলের শুরু হয়েছিল মিথেন, নাইট্রোজেন, নাইট্রোজেন অক্সাইড ও অ্যামোনিয়া দিয়ে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, এই রাসায়নিক বিবর্তন পর্বে মুক্ত অক্সিজেনের কোন অবকাশ ছিল না। এর অন্যতম কারণ অক্সিজেনের অতিমাত্রায় বিক্রিয়া-প্রবণতা। বিক্রিয়ার সম্ভাবনা তথা সুযোগ পুরোপুরি নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত অক্সিজেনকে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া সম্ভব ছিল না। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। প্রাথমিক বায়ুমণ্ডল ও জলমণ্ডল তৈরী হওয়ার পরেও সৌর ও মহাজাগতিক বিকিরণ একইভাবে পৃথিবীর উপরিভাগে আছড়ে পড়ত। এইসব বিকিরণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল আয়নীকারক। প্রচুর সংখ্যায় মুক্ত নিউট্রন কণিকা বিকিরণের সাথে পৃথিবীতে পৌঁছাত। আয়নীকারক বিকিরণ, বিশেষত অতিবেগুনী বিকিরণের প্রভাবে জলমণ্ডলের ওপরদিকের জল কিছু পরিমাণে ভেঙে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন তৈরী হত, কিন্তু এই অক্সিজেন, অন্যান্য পদর্থের সাথে বিক্রিয়ার কারণে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সুযোগ পেত না। হাইড্রোজেন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সুযোগ পেলেও তখনকার বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেশী থাকার জন্য অধিকাংশ হাইড্রোজেন অণুর মূল গড় বর্গ বেগ (root mean square velocity) পৃথিবীর অভিকর্ষ সাপেক্ষে মুক্তিবেগের মান (11 km/sec) ছাড়িয়ে যেত এবং মহাকাশে হারিয়ে যেত। এতদ্সত্ত্বেও কিছু পরিমাণে হাইড্রোজেন বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করত।

সূর্য তথা মহাকাশই আদিম পৃথিবীতে আয়নীকারক বিকিরণের একমাত্র উৎস ছিল না। ক্রাষ্ট অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসা গলিত পদার্থও ছিল একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। ঘন ঘন আগ্নেয় বিদারণের সাথে গ্যাসীয় মৌল ও যৌগ ছাড়া অন্যান্য যে সব পদার্থ থাকত সেগুলির একটা বড় অংশ পরবর্তীতে জলমণ্ডলে মিশে যায় এবং আরও পরবর্তীতে স্থলভূমি (নরম মাটির আস্তরণ) বিকাশে এদের অংশগ্রহণ ছিল। জলে দ্রাব্য বা অদ্রাব্য যাই হোক না কেন, এগুলি সবই কঠিন মৌল বা যৌগ পদার্থ। এইসব পদার্থের মধ্যে বিপুল পরিমাণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উপস্থিত ছিল। খনিতে পুঞ্জীভূত অবস্থানের কথা বাদ দিলেও, স্থলভূমি এবং জলমণ্ডলের যে কোন নমুনা বিশ্লেষণে এইসব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের অস্তিত্ব, অতীব

ক্ষুদ্র পরিমাণে হলেও এখনও বিদ্যমান। তেজষ্ক্রিয় ও সাধারণ পদার্থের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য হল এই যে সাধারণ পদার্থগুলি পৃথিবীর বুকে আজকে যে পরিমাণে আছে আদিম পৃথিবীতেও সেই পরিমাণটা প্রায় একই ছিল, কিন্তু তেজষ্ক্রিয় পদার্থ আজকে যে পরিমাণে আছে অতীতকালে বিভিন্ন সময়ে সেই পরিমাণ অনেক বেশী ছিল। যে কোন তেজষ্ক্রিয় মৌল তথা আইসোটোপ বিকিরণের (α, β ও γ বিকিরণ) মাধ্যমে ভর হারিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে অর্ধেক পরিমাণে পরিণত হয়। এই সময়কে ওই মৌল বা আইসোটোপটির অর্ধায়ু[4] বলে। ধরা যাক্, রেডিয়ামের কথা। বর্তমান পৃথিবীর সমগ্র উপরিতলে সব মিলিয়ে রেডিয়ামের পরিমাণ প্রায় 1.8×10^{13}gm। রেডিয়ামের অর্ধায়ু 1620 বছর। তাহলে দশটি অর্ধায়ু অর্থাৎ 16200 বছর আগে রেডিয়ামের পরিমাণ ছিল কম বেশী 1.8×10^{16}gm, যা বর্তমান পরিমাণের চাইতে 1000 গুণ বেশী। খনিতে এক টন ইউরেনিয়াম পিছু 300 মিলিগ্রাম রেডিয়াম পাওয়া যায়। ইউরেনিয়াম 235 এর অর্ধায়ু 70 কোটি বছর। অতএব 350 কোটি বছর পূর্বে অর্থাৎ যে সময়ে পৃথিবীতে জড়জগতের বক্ষ ভেদ করে প্রাণের প্রকাশ শুরু হয়েছিল সে সময়ে পৃথিবীতে ইউরেনিয়াম 235 এর পরিমাণ ছিল আজকের পরিমাণের 32 গুণ। রেডিয়াম ও অন্যান্য বিঘটিত আইসোটোপের পরিমাণও ছিল স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশী। বিঘটিত ছাড়াও অনেক তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ আছে সম্ভবত যাদের সঙ্গে নিয়েই পৃথিবী এই কক্ষপথে হাজির হয়েছিল। 350 কোটি বছর পূর্বে এদের প্রত্যেকটিই বিপুল পরিমাণে ছিল[7]। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, পটাশিয়াম-40, কার্বন 14, ইত্যাদি এদের মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য। আবার আরও অনেক এমন তেজষ্ক্রিয় মৌল সেসময় পৃথিবীর উপরিভাগে অস্তিত্বসম্পন্ন ছিল যেগুলি অর্ধায়ুর নিয়মে অতীতের কোন সময়ে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে এবং স্বাভাবিক কারণেই বর্তমানে তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। অতএব দেখা যাচ্ছে 300/350 কোটি বছর আগে পৃথিবীর উপরিতলে বিশাল পরিমাণে তেজষ্ক্রিয় মৌলের অস্তিত্ব ছিল এবং এদের থেকে নিয়মিত তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ ঘটত। মহাজাগতিক বিকিরণের অংশ হিসেবে আগত অতিবেগুনী বিকিরণের সঙ্গে এই তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ একত্র হয়ে পৃথিবীর উপরিতলে এক উচ্চশক্তি ও ক্ষমতাসম্পন্ন আয়নীকারক বিকিরণের বলয় অবশ্যই তৈরী হয়েছিল। অতএব যে রাসায়নিক বিবর্তনের পথ ধরে একসময় প্রাণের প্রকাশ বাস্তব হয়ে উঠেছিল তার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস হিসেবে এই আয়নীকারক বিকিরণের বলয় নিয়মিতভাবে শক্তি যুগিয়েছে। অঙ্কের নিয়মে আয়নীকারক বলয়ের শক্তি ক্রমহ্রাসমান হলেও সুদীর্ঘকাল ধরে শক্তির হ্রাসের হার ছিল খুবই কম। এর একটি বড় কারণ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার বিবর্তনের আগে পর্যন্ত অতিবেগুনী বিকিরণের অপরিবর্তিত পরিমাণ।

প্রাণের প্রকাশের পর জৈব বিবর্তন

অতএব মিলার, পোন্নামপেরুমা, কেলভিন, অরো, ফক্স প্রমুখ বিজ্ঞানীরা '৬০ এর দশকে গবেষণাগারে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন তা ৩৫০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর উপর

স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঘটে যাওয়া রাসায়নিক বিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি, যা থেকে খুব স্পষ্টভাবেই সিদ্ধান্ত করা যায়— প্রায় ৩৫০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর জলমণ্ডলে প্রাণের প্রকাশ ঘটেছিল রাসায়নিক বিবর্তনের পথে। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল বিভিন্ন অজৈব পদার্থ এবং শক্তির অন্যতম যোগানদার ছিল আয়নীকারক বিকিরণ। বিভিন্ন প্রজাতির কোষে যে পরিমাণ জেনম থাকে তার সবটা প্রয়োজন হয় না। মানুষের কথাই ধরা যাক্। মানবকোষের জেনমে মোট DNA এর দৈর্ঘ্য 3.2×10^9 নিউক্লিওটাইড-জোড়া (bp) এবং কার্যকরী জিনের সংখ্যা প্রায় 25000। পাশাপাশি অকার্যকারী বা pseudogene এর সংখ্যা 20,000 এরও অধিক।

যে ন্যূনতম গঠনগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রাণের প্রকাশ ঘটেছিল তা যদি সেখানেই থেমে থাকত তাহলে পৃথিবীর বুকে এই বিশাল জৈব বৈচিত্র্য সম্ভব হোত না। বাস্তবে তা হয়নি। ন্যূনতম গঠনগত বৈশিষ্ট্যসহ প্রাণপদার্থ বিকাশ লাভের পর থেকেই বিবর্তনের পথে যাত্রা শুরু করেছে। প্রথমে ভাইরাস এবং তারপর ক্রমে ভাইরাস থেকে ব্যাক্টিরিয়া, ব্যাক্টিরিয়া থেকে প্রোক্যারিওটিক কোষ, প্রোক্যারিওটিক কোষ থেকে ইউক্যারিওটিক কোষ ও ইউক্যারিওটিক কোষ বা এক কোষী জীব থেকে বহুকোষী জীবনের বিবর্তন ঘটেছে। বহুকোষী জীব পরবর্তীকালে আরও জটিল বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অসংখ্য জীব প্রজাতির উদ্ভবকে বাস্তব করে তুলেছে। এই বিবর্তনের পথ মসৃণ ছিল না। ভাইরাস থেকে ব্যাক্টিরিয়ার বিবর্তনে সুদীর্ঘসময় লেগেছে। পূর্বেই আমরা বলেছি ভাইরাস জড় এবং জীবের মধ্যবর্তী অবস্থা। ভাইরাস যখন জড় পরিবেশে অবস্থান করে তখন তার মধ্যে জড়ের বৈশিষ্ট্য প্রকট এবং ভাইরাস যখন জীবের মধ্যে অবস্থান করে তখন তার মধ্যে জীবের বৈশিষ্ট্য প্রকট। অর্থাৎ, ভাইরাস বিভাজনের মাধ্যমে নিজের প্রতিরূপ গঠন করতে পারে। প্রথম যখন ভাইরাসের বিবর্তন ঘটেছে তখন ভাইরাস ছাড়া আর কোন জৈব প্রজাতির অস্তিত্ব ছিল না। অতএব ভাইরাস এরকম জৈব বৈশিষ্ট্য ধারণ করা সত্ত্বেও সুদীর্ঘকাল জড় হিসাবেই অবস্থান করেছে। বিভাজনক্ষমতা সহ ভাইরাস প্রজাতির উদ্বর্তনে অনেক সময় লেগেছে। আবার কোষীয় জীবের (cellular life) বিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও অক্সিজেনহীন পরিবেশের কারণে পরবর্তী বিবর্তনকে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সালোকসংশ্লেষক উপাদানের (photosynthetic pigment) বিবর্তন না ঘটলে পরবর্তী বিবর্তন ঘটা সম্ভব ছিল না। সালোকসংশ্লেষক উপাদান বা ক্লোরোফিলের বিবর্তন ঘটার পর দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। (1) জৈব প্রক্রিয়ায় খাদ্য উৎপাদন এবং (2) বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের অনুপ্রবেশ। বাস্তবিক এই দুটি পরিবর্তনের জন্য পরবর্তীকালে বিবর্তন অনেক সুসংহত ভাবে এগোতে পেরেছিল। বিবর্তনের পথে এরকম অনেক জটিল বাধা বহুবার এসেছে এবং এক একটি বাধাকে অতিক্রম করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে।

জীবজগৎ যে জৈব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই সুবিশাল বৈচিত্র্য অর্জন করেছে তা আড়াইশো বছর আগেও আলোচনা বা চর্চার বিষয়বস্তু ছিলনা। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে প্রতিটি সম্প্রদায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম (religion) নির্দেশিত ধারণাকেই মেনে চলত। এবিষয়ে প্রবন্ধের শুরুতেই

আলোচনা করা হয়েছে। সম্ভবত ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যামার্কই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যে জৈব বির্বতনমূলক ধারণার বুনিয়াদ তৈরী করেন। ল্যামার্কের মতবাদের অসম্পূর্ণতা এবং অপর্যাপ্ততা (inadequacy) থাকলেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এরপর যাঁরা জৈব বিবর্তনকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে পেরেছিলেন তারা হলেন চার্লস রবার্ট ডারউইন এবং আলফ্রেড ওয়ালেস। ডারউইন এবং ওয়ালেস দুজনেই সমসাময়িক এবং একই সঙ্গে বিবর্তন সম্পর্কে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। এই সিদ্ধান্তটি 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' নামে খুবই পরিচিত। যে কোন প্রজাতির উদ্বর্তনের পর প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হলে অর্থাৎ প্রকৃতির সকল উপাদানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার পদ্ধতি রপ্ত করতে পারলে প্রজাতিটি নিজের প্রতিরূপ গঠনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে টিকে থাকার ছাড়পত্র পাবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ডারউইন এই মতও পোষণ করতেন যে কোন এক ন্যূনতম গঠনগত বৈশিষ্ট্যসহ প্রাণ পদার্থ (simplest form of life) থেকে এই বিশাল জৈব বৈচিত্র্যের বির্বতন ঘটেছে। কিন্তু একটি প্রজাতি থেকে কেমন করে আর একটি প্রজাতির উদ্ভব ঘটে বা প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার মত গঠনগত বৈশিষ্ট্য কেমন করে প্রজাতির দ্বারা অর্জিত হয় এবং এই অর্জনের পেছনে কী কারণ সে সম্পর্কে অসংখ্য প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন থেকেই যায়। ডারউইন এবং ওয়ালেস যৌথভাবে তাঁদের গবেষণা প্রকাশ করেন 1858 সালে এবং ওই সময়কালে এইসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না মেলার কারণ জিনবিদ্যা সম্পর্কে কোনরকম ধারণার অভাব। জিনবিদ্যার অগ্রদূত হিসাবে বংশগতির নিয়মাবলী নিয়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন মেন্ডেল[৯] 1866 সালে, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক্, এই গবেষণাপত্রটি তাৎক্ষণিকভাবে গুরুত্ব পায়নি এবং যথারীতি তা লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। মেন্ডেলের এই গবেষণাটিকে পরবর্তীকালে 1900 সালে De Vries, Correns এবং Tschermak পুনরাবিষ্কার করেন। এর পর থেকে জিনবিদ্যার গবেষণা ও বিকাশ দ্রুততা লাভ করে এবং বর্তমানে এটা এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এখন আর অজানা নয়।

একটি জৈব প্রজাতির যাবতীয় গঠনগত (anatomical), শারীরবৃত্তীয় (physiological) ও ভ্রূণ-বিকাশ (teratogenic) সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ নথিভুক্ত থাকে তার জিন-এর মধ্যে, যাকে আমরা বলি জেনেটিক কোডন বা কোড (Genetic Codon)। আগেই বলা হয়েছে DNA এবং RNA বিভাজনের মাধ্যমে প্রজাতি নিজের প্রতিরূপ গঠন করে। কোষযুক্ত (cellular life) জীবে কোষস্থিত নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজমের মধ্যে জিন থাকে। অসংখ্য DNA অণু একত্র সজ্জিত হয়ে যে গঠনরূপ তৈরী করে তাকে ক্রোমোজোম বলে। অপরদিকে RNA নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে থাকলেও নিউক্লিয়াসের বাইরে অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের মধ্যেও এর অস্তিত্ব প্রকট। DNA এবং RNA প্রাণ রাসায়নিক অণু হলেও, অন্যান্য যে কোন রাসায়নিক বা জৈব রাসায়নিক অণু থেকে পৃথক। অন্যান্য অণুদের ক্ষেত্রে যেমন আণবিক ভর নির্দিষ্ট, DNA ও RNA অণুর ক্ষেত্রে তা নয়। এক একটি DNA/RNA অণুর আণবিক ভর এক এক রকম। DNA/RNA এর আণবিক ভর নির্ভর করে নিউক্লিওটাইডের জোড়ার

উপর। একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমে যে সংখ্যক DNA অণু থাকে সেই সংখ্যাটিও যেমন নির্দিষ্ট তেমনি কোন ক্রোমোজোমের কোন একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে যে DNA অণুটি থাকে তার নিউক্লিওটাইড-জোড়া তথা আণবিক ভরও নির্দিষ্ট। বিষয়টি আরও একটু পরিষ্কার করা যাক্। ধরা যাক্, কোন একটি কোষে চার জোড়া ক্রোমোজোম আছে। এর প্রথম জোড়া ক্রোমোজোমের যে কোনটিতেই Y সংখ্যক DNA, দ্বিতীয় জোড়াতে T সংখ্য DNA, তৃতীয় জোড়াতে S সংখ্যক DNA এবং চতুর্থ জোড়াতে P সংখ্যক DNA অণু আছে। তাহলে পৃথিবীর যে কোন স্থানেই এই জীবকোষটি দেখা যাক্ না কেন তার নিউক্লিয়াসে চার জোড়া ক্রোমোজোম থাকবে এবং তাদের DNA অনুর সংখ্যাও হবে যথাক্রমে Y, T, S ও P। নির্দিষ্টতার নিয়ম এখানেই শেষ নয়। ক্রোমোজোমের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট অবস্থানে একটি DNA অণুর নিউক্লিওটাইড জোড়ার সংখ্যা ও আণবিক ভরও নির্দিষ্ট। এই সমস্ত নির্দিষ্টতার নিয়মগুলিকে একত্র করে একটি মাত্র নির্দিষ্টতার নিয়ম তৈরী করা হয়েছে। এর নাম জেনম Genom অর্থাৎ যে কোন একটি নির্দিষ্ট কোষে মোট DNA এর ভর নির্দিষ্ট। এই জেনমভর দিয়েও প্রজাতির জেনেটিক পরিচিতিকে নির্ণয় করা সম্ভব।

কম গুরুত্বের হলেও ক্রোমোজোম নিয়ে আরও একটি নির্দিষ্টতার নিয়ম রয়েছে। কোন জীব প্রজাতির দেহ যে সব কোষ দিয়ে তৈরী তার প্রত্যেকটি কোষেই ক্রোমোজোমের জোড়া সংখ্যা নির্দিষ্ট। যেমন ধরা যাক্, মানুষের ক্ষেত্রে যে কোন দেহ কোষে 23 জোড়া ক্রোমোজোম রয়েছে। অর্থাৎ, পৃথিবীর যে কোন মানুষের যে কোন দেহকোষে 23 জোড়া ক্রোমোজোম পাওয়া যাবে। এই সংখ্যা দিয়েও প্রজাতির পরিচয় নির্ণয় করা যায়। এতকাল এভাবেই প্রজাতির পরিচয় নির্ণয় করা হোত। কিন্তু এখানে একটা অসুবিধা রয়েছে। এই বিশাল জৈব বৈচিত্র্যে অংসখ্য জীব প্রজাতি রয়েছে। ক্রোমোজোম জোড়ার সংখ্যা একাধিক প্রজাতিতে একই হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় এবং বাস্তবেও তাই। কিন্তু জেনম কখনও এক হবে না। অতএব জেনম দিয়ে প্রজাতি পরিচিতি নির্ধারণ সবচাইতে যৌক্তিক। তবুও জেনম এবং ক্রোমোজোম জোড়ার সংখ্যা— উভয়েই জৈব বিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ।

যদি জেনমের বিভিন্নতা সহ একই সংখ্যার ক্রোমোজোম সব প্রজাতিতে থাকত তাহলে তত্ত্বগতভাবে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা ছিলনা। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। একাধিক প্রজাতিতে একই সংখ্যক ক্রোমোজোম জোড়া থাকলেও সামগ্রিকভাবে প্রজাতির বিভিন্নতা অনুযায়ী ক্রোমোজোম জোড়ার সংখ্যারও বিভিন্নতা রয়েছে। অতএব তত্ত্বগতভাবে এটা ধরে নিতেই হবে যে একটি প্রজাতি থেকে যখন আর একটি প্রজাতির বিবর্তন ঘটে তখন জেনমের পরিবর্তন অবশ্যম্ভারি, কিন্তু ক্রোমোজোম জোড়ার সংখ্যার পরিবর্তন হতেও পারে, নাও হতে পারে। অতএব জৈব বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে জেনম সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও, ক্রোমোজোম-জোড়া সংখ্যাও গুরুত্বপূর্ণ।

এবার দেখা যাক্, বিভিন্ন বৈশিষ্টসমূহ জেনমে নথিভুক্ত থাকে কীভাবে। বৈশিষ্ট্য বহু

থাকলেও, যে বৈশিষ্ট্য প্রতিরূপের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে না তাকে বৈশিষ্ট্য বলা যাবে না। প্রতিরূপ তৈরী হয় প্রধানত DNA বিভাজনের মাধ্যমে। কিন্তু বৈশিষ্ট্যের বিকাশ তথা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণে DNA যে কাজটি RNA এর সাহায্যে করে তা হোল প্রোটিন উৎপাদন। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের অনুমান, জীবজগতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় এক লক্ষর কাছাকাছি প্রোটিনের অস্তিত্ব রয়েছে। কার্যকরী ভূমিকা অনুসারে এগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা সাধারণ প্রোটিন, উৎসেচক (enzyme), সহ-উৎসেচক (co-enzyme), হর্মোন এবং স্নায়ু-অনুভূতি সঞ্চারক (neuro-transmitter) প্রভৃতি। এই শ্রেণীবিভাজন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে— এরকম দাবী করা এখনও সম্ভব নয়। এখন পর্যন্ত অসংখ্য প্রোটিনের চিহ্নিতকরণ ও প্রকৃতি নির্ণয় গবেষণার বিষয়।

DNA বা RNA এর মত প্রোটিনও একটি জটিল প্রাণ রাসায়নিক যৌগ যার একক অ্যামাইনো অ্যাসিডের অণু। অ্যামাইনো অ্যাসিডের অসংখ্য অণুকে DNA ও RNA পেপটাইড বন্ধনী দিয়ে যুক্ত করে প্রোটিন তৈরী করে। স্বাভাবিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংখ্যা মাত্র 20টি। যে কোন DNA অণু যে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে কাজ করতে পারে না। এ বিষয়ে একটি অদ্ভুত শৃঙ্খলা রয়েছে যাকে আমরা জেনেটিক কোডন বা কোড বলি।

DNA অণুগঠনের প্রাথমিক পর্বে একটি ক্ষার অণু, একটি ফসফেট মূলক (PO_4) ও একটি ডিঅক্সিরিবোস সুগার অণু মিলে একটি নিউক্লিওটাইড তৈরী হয়। DNA-এর ক্ষারীয় যৌগ চার প্রকার। যথা অ্যাডেনাইন (A), গুয়ানাইন (G), সাইটোসাইন (C) ও থায়ামাইন (T)। অতএব DNA অণুতে চার রকম নিউক্লিওটাইড রয়েছে। দুটি নিউক্লিওটাইডের ক্ষারীয় অণু হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা যুক্ত হয়ে নিউক্লিওটাইড জোড়া বা Base Pair (bp) গঠন করে। bp গঠনে যেমন খুশী ক্ষারীয় অণু যুক্ত হতে পারে না। মাত্র চার রকম bp সম্ভব। যথা A–T, T–A, C–G এবং G–C। একটি bp সমান্তরালভাবে অপর আর একটি bp এর সাথে ফসফেট ও সুগারের মধ্যে কার্বন-অক্সিজেন বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত হয়। এভাবে একাধিক bp যুক্ত হয়ে একটি DNA অণু তৈরী হয়। bp গুলি সমান্তরালভাবে যুক্ত হওয়ার পর দু'দিকেই ক্ষারীয় অণুগুলিকে সরলরেখায় কল্পনা করা যায় এবং A, G, C ও T এর বিভিন্ন অণুক্রমও (sequence) কল্পনা করা যায়। কিন্তু পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে: A, G, C ও T এই চারটি ক্ষারীয় অণুর মধ্যে যে কোন তিনটিকে নিয়ে যতগুলি অণুক্রম কল্পনা করা সম্ভব ততগুলি জেনেটিক কোড হতে পারে। এই তিনটির মধ্যে একটি অণু পরপর তিনবার আসতে পারে বা একটি অণু দু'বার ও অপর যে কোন আর একটি অণু একবার আবৃত্ত হয়ে অণুক্রম গঠন করতে পারে। এভাবে 4^3 বা 64 টি জেনেটিক কোড পাওয়া গেছে যার মধ্যে 61 টি কার্যকরী ও তিনটি অকার্যকরী। একটি কোড/কোডন একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য নির্দিষ্ট। অবশ্য একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য একাধিক কোড হতে পারে। যাইহোক 61 টি কোডের সাহায্যে মোট 20 টি অ্যামাইনো অ্যাসিড জীবজগতের প্রয়োজনীয় যাবতীয় প্রোটিন তৈরী করে। অতএব সংখ্যাতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড অসংখ্য

প্রোটিন উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে।

বিভিন্ন প্রজাতির কোষে যে পরিমাণ জেনম থাকে তার সবটা প্রয়োজন হয়না। ইউক্যারিওটিক কোষ দিয়ে তৈরী যে কোন প্রজাতির ক্ষেত্রেই বিষয়টা একই রকম। অল্প কিছু জিনের কার্যক্রম রয়েছে, অর্থাৎ তাদের জেনেটিক কোড রয়েছে। অবশিষ্ট বেশীরভাগ জিনের কোন ক্রিয়া (function) আছে কিনা জানা নেই। যে সব জিনের কার্যক্রম জানা আছে তাদের সংখ্যাটাও জেনেটিক কোডের সংখ্যার তুলনায় কম নয়, অতএব একই জেনেটিক কোড সম্পন্ন কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন bp সংখ্যা বিশিষ্ট অসংখ্য জিন একটি কোষে থাকবে— এটাই স্বাভাবিক। বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে উপরে উল্লিখিত 61 টি কার্যকরী জেনেটিক কোডের কোনরকম পরিবর্তনের প্রশ্ন নেই। বিগত 300/350 কোটি বছর ধরে এই 61 টি কার্যকরী কোডই সমগ্র জীবজগতে বিচরণ করছে। জৈব বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ জেনম ভর এবং ক্রোমোজোম সংখ্যার পরিবর্তন। পৃথিবীতে এমন দুটি প্রজাতি নেই যাদের জেনম ভর এবং ক্রোমোজোম সংখ্যা একই রকম। এক প্রজাতি থেকে আর এক প্রজাতির উদ্বর্তন ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে জেনম ভরেরও পরিবর্তন ঘটেছে। কখনও কখনও ক্রোমোজোম সংখ্যারও পরিবর্তন ঘটেছে। যখনই জেনম ভরের কোন পরিবর্তন ঘটেছে তখনই তা কোন না কোন জেনেটিক কোড দ্বারা নথিভুক্ত হয়েছে। এই নথিভুক্তির বিষয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে। যে কোন কোষে এটা ঘটলে চলবে না। যে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে প্রজাতির প্রতিরূপ গঠনে সক্ষম একমাত্র সেই কোষেই এই পরিবর্তন ঘটলে এবং তা কোন জেনেটিক কোড দ্বারা নথিভুক্ত হলে নতুন প্রতিরূপের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন সহ তা সঞ্চারিত হতে পারে। নতুন প্রতিরূপটি একটি নতুন প্রজাতির ভিত্তি। এই নতুন প্রতিরূপটি যদি পরবর্তীকালে প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে টিকে যেতে পারে এবং ক্রমান্বয়ে প্রতিরূপ গঠনে সক্ষম হয় তাহলে আস্তে আস্তে এক সময় তা নতুন প্রজাতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যায়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সমগ্র জীবজগৎ একটা ন্যূনতম গঠন বৈশিষ্ট্য সহ কোন সরল প্রাণ-পদার্থ থেকে জৈব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে। সরল প্রাণ-পদার্থ থেকে ইউক্যারিওটিক এক কোষী জীব পর্যন্ত বিবর্তন সুদীর্ঘ সময় ধরে খুব জটিল ও ধীর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। বিবর্তনের এই পর্যায় পর্যন্ত প্রতিরূপ গঠনকারী পৃথক কোন কোষ বা সংগঠনের অস্তিত্ব ছিলনা। একটি একক কোষ বা সংগঠনই সমগ্র জীব। কিন্তু এককোষী থেকে বহুকোষী জীব বিবর্তিত হওয়ার পর প্রতিরূপ গঠনকারী কোষ এবং জীবদেহের অন্যান্য কাজ চালাবার জন্য কোষ ক্রমশ পৃথক হতে শুরু করল। প্রতিরূপ গঠনকারী কোষ বা জনন কোষ (germ cell) এবং অন্যান্য কাজ চালাবার জন্য কোষ বা দেহ কোষ (somatic cell)। দেহকোষ বিভাজনের মাধ্যমে দুটি অপত্য কোষ তৈরী হয় এবং প্রত্যেকটিতে মাতৃকোষের সমসংখ্যক ক্রোমোজোম বা সমান জেনম ভর থাকে। জনন কোষ বিভাজনের মাধ্যমে চারটি অপত্য কোষ তৈরী হয় এবং প্রত্যেকটিতে মাতৃকোষের অর্ধেক ক্রোমোজোম

বা অর্ধেক পরিমাণ জেনম ভর থাকে। বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিটি খুবই সহজ। দুটি বিপরীত জনন অপত্য কোষ একত্র যুক্ত হয়ে প্রতিরূপের ভ্রূণ তৈরী করে এবং এর পর ভ্রূণটি ক্রমাগত দেহকোষ বিভাজনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রতিরূপ গঠন করে। প্রক্রিয়া হিসাবে এর কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও সমগ্র জীবজগতে এই প্রক্রিয়াটিই সবচেয়ে প্রকট (dominant)। যাই হোক, পূর্বোক্ত জেনম ভরের পরিবর্তন এই জননকোষে ঘটতে হবে, নতুবা প্রতিরূপের মাধ্যমে তা সঞ্চারিত হবে না।

একক জিনগত পরিবর্তন (gene mutation) সামগ্রিক জেনমভরের পরিবর্তনের একক। ডারউইন ও ওয়ালেস যখন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' মতবাদ ব্যক্ত করেছিলেন তখন জিনবিদ্যার বিকাশ ঘটেনি— একথা আগেই বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে দ্য ভ্রাইসের মিউটেশন তত্ত্বও প্রাকৃতিক নির্বাচনের পূর্ববর্তী পর্যায় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেনি। একটি নতুন প্রজাতির উদ্বর্তনের পরে প্রাকৃতিক নির্বাচন কার্যকরী হয়। কিন্তু একটি নতুন প্রজাতির উদ্বর্তনের জন্য তার পূর্ববর্তী প্রজাতির জনন কোষে যে জিনগত পরিবর্তন প্রয়োজন তা কেমন করে ঘটে? বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জীবজগতের ক্রম (order) অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে কোন জীব প্রজাতি তার পূর্ববর্তী জনক প্রজাতি (parent species) থেকে উন্নত, তাহলে এটা ভাবা স্বাভাবিক যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের অভিমুখেই জিনগত পরিবর্তন ঘটে। যদি সত্যিই এরকম ঘটত তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের আগে আর কোন রকম পর্যায় ভাবার কোন অবকাশ থাকত না। কিন্তু বাস্তবে এটা সম্ভব নয়। এরকম ভাবনাকে সম্ভব করে তুলতে হলে জীব নিরপেক্ষ এমন কোন কিছুকে মঞ্চে দাঁড় করাতে হয় যে একটা নিয়ম বা শৃঙ্খলা অনুসরণ করে ক্রমান্বয়ে জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে গেছে। এই বস্তুজগতে এরকম কোন কিছুকেই এই দায়িত্বের অধিকারী হিসাবে ভাবা সম্ভব নয়।

এই সমস্যাটি সমাধানের পথে এগিয়ে এলেন মোটো কিমুরা[6] (Motto Kimura)। জাপানের এই বিবর্তন বিজ্ঞানীর প্রকল্প অনুযায়ী— ".... at the molecular level most evolutionary change and most of the variability within species are not caused by Darwinian selection but by random drift of mutant alleles that are selectively neutral or nearly neutral", অর্থাৎ প্রজাতির মধ্যে অধিকাংশ বিবর্তনিক পরিবর্তন এবং অধিকাংশ পরিবর্তনীয়তা আণবিক পর্যায়ে ডারউইনীয় নির্বাচনের কারণে ঘটে না, বরং তা ঘটে জিনের এলোপাথাড়ি পরিবর্তনের জন্য যা নির্ধারিতভাবে নিরপেক্ষ অথবা প্রায় নিরপেক্ষ। সংক্ষেপে কিমুরার এই মতবাদকে বলা হয় Neutral Mutation-Random Drift Hypóthesis. কিমুরা Random Drift of Mutant Alleles-কে আরও স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বললেন যে জিন মিউটেশন আসলে DNA বার্তায় (message) পরিবর্তন। এই পরিবর্তন দু'টো বিভাগে বিভক্ত, যথা (1) একটি নিউক্লিওটাইড দ্বারা অপর আর একটি নিউক্লিওটাইডের প্রতিস্থাপন; এবং (2) এক বা একাধিক নিউক্লিওটাইডভুক্ত ক্ষারীয় যৌগের (A, T, G, ও C) অন্তর্ভুক্তি বা নিষ্ক্রমণের মাধ্যমে জিনের গঠনগত পরিবর্তন।

কখনও কখনও বৃহৎ DNA খণ্ডের স্থান বা ক্রম পরিবর্তন (transposition) এবং উৎক্রমণের (inversion) মাধ্যমেও গঠনগত পরিবর্তন ঘটতে পারে। গঠনগত পরিবর্তনের চাইতে নিউক্লিওটাইড প্রতিস্থাপন খুব বেশী মাত্রায় ঘটে এবং এটাই আণবিক স্তরে সবচাইতে বেশী প্রচলিত বিবর্তনিক পরিবর্তন।

কিমুরার প্রস্তাব যথেষ্ট বাস্তব হলেও তা দিয়ে এই সুবিশাল জীবজগৎকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিমুরার প্রস্তাব অনুযায়ী জেনমভরের কমবেশী পরিবর্তন ঘটলেও বিভিন্ন প্রজাতিতে জিন সংখ্যা ও ক্রোমোজোম সংখ্যার পরিবর্তনীয়তা (variation) সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আধুনিক অণুজীববিদ্যার (molecules biology) গবেষণা এ বিষয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছে এবং সেখান থেকে আমরা নতুন জিনের উদ্বর্তনের বিষয়টা বুঝে নিতে পারি।

একটা নতুন জিন কখনও কোষের মধ্যে শর্করা, ফসফেট ও ক্ষারীয় যৌগের বিক্রিয়ায় পৃথকভাবে তৈরী হয় না। বরং একটি পূর্বতন জিন থেকেই নতুন একটি জিনের উদ্বর্তন ঘটে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় Duplication বা অনুলিপি গঠন এবং নতুন জিনটিকে বলা হয় ডুপ্লিকেটিং জিন। কোষ বিভাজনের সময় কোষের জেনম পুরোপুরি দু'ভাগ হয়ে দুটি অপত্য কোষে অবস্থান করে। কিন্তু কখনও জেনম বিভাজনের সময় গন্ডগোল দেখা দেয়। কখনও কখনও জেনমের একটি বা একাধিক DNA এর বিভাজন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই সব ক্ষেত্রে বিভাজিত অংশ সহ মূল DNAটি একটি কোষেই অবস্থান করে এবং যদি সেই কোষটিই জননে অংশগ্রহণ করে তাহলে নতুন অপত্যটি প্রায় একটি অতিরিক্ত DNA সহ জন্মাবে। দুটি একই রকম DNA এর মধ্যে একটি প্রোটিন সংশ্লেষের অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে এবং অপরটি ক্রমাগত নিউটেশনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করবে। এটা দেখা গেছে যেসব জিন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন বা RNA অণু সংশ্লেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের মধ্যে মিউটেশনের হার খুবই কম। মিউটেশন বেশী ঘটে কোডনহীন DNA, অপেক্ষাকৃত কম দায়িত্বপ্রাপ্ত DNA এবং এ জাতীয় ডুপ্লিকেটিং DNA তে। যাই হোক্, এইভাবে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ডুপ্লিকেটিং DNAটি উপরোক্ত কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং একই প্রজাতির মধ্যে একটি পৃথক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এইভাবে এক সময় মূল প্রজাতির সাথে জনন বিচ্ছিন্নতা (reporductive isolation) ঘটে গেলে নতুন গোষ্ঠীটি একটি নতুন প্রজাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে ডুপ্লিকেটিং DNA তে মিডটেশন কিমুরার প্রস্তাব অনুযায়ীই ঘটে। এরকম ডুপ্লিকেটিং জিন বা DNA একটি প্রজাতির বিভিন্ন এককে এবং জেনমের বিভিন্ন DNA তেই ঘটতে পারে। অতএব একটি প্রজাতি থেকে একাধিক পরিবার বা গোষ্ঠী তৈরী হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত একাধিক প্রজাতির উদ্বর্তন ঘটতে পারে, যাদের জেনমে বৃহদংশ জিন একইরকম। প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের পার্থক্য অল্প কিছু জিন-এর পরিপ্রেক্ষিতে। এর ভাল উদাহরণ প্রাইমেট বর্গের প্রজাতিরা। মানুযসহ অন্যান্য বানর জাতীয় প্রজাতিদের মধ্যে জিনগত সাদৃশ্য অনেক, বৈসাদৃশ্য খুবই কম।

জেনমভর ও ক্রোমোজোম জোড়া সংখ্যার পরিবর্তনের সঙ্গে কিমুরার মতবাদ ও উপরোক্ত মিউটেশনের প্রক্রিয়াগুলি পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব জীব নিরপেক্ষ কোন কিছুকে আর মঞ্চে দাঁড় করানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু একটি সমস্যা থেকেই গেল। কিমুরার প্রস্তাব অনুযায়ী (বাস্তবেও) প্রতিস্থাপন ও গঠনগত পরিবর্তন কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে হয় না। বরং তা হয় এলোপাথাড়ি। তাহলে প্রাণী বা উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস (taxonomy) অনুযায়ী পূর্ববর্তী নিম্নক্রম (lower order) কীভাবে সম্ভব? প্রথমটি অর্থাৎ কিমুরার মতবাদ বাস্তব কিন্তু শৃঙ্খলাহীন এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ নিম্নক্রম থেকে উচ্চক্রমে বিবর্তন অবাস্তব কিন্তু সুশৃঙ্খল। এই দুইয়ের সমন্বয়ের জন্য আমাদের প্রয়োজন ডারউইন-ওয়ালেসের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'।

যে কোন প্রজাতিই তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে শারীরিক আকারের অধিকারী। যদি কখনও তার জনন কোষে এমন কোন জিনগত পরিবর্তন ঘটে যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তী প্রতিরূপে যে বৈশিষ্ট্য (phenomenal character) আবির্ভাবের সম্ভাবনা তা শারীরিক আকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাহলে এই জিনগত পরিবর্তন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। এই কারণে এলোপাথাড়িভাবে জিনগত পরিবর্তন হলেও খুব অল্প সংখ্যক পরিবর্তন প্রতিরূপের শারীরিক আকার বা গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে টিকে গেলে আসে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রশ্ন। প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যদি উক্ত প্রতিরূপ ক্রমান্বয়ে প্রতিরূপ গঠনে সমর্থ হয় তাহলে কোন এক সময়ে নতুন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটার সম্ভাবনা তৈরী হয়। অতএব আণবিক স্তরে এলোপাথাড়িভাবে জিনগত পরিবর্তন ঘটলেও শেষ পর্যন্ত খুব অল্প সংখ্যক পরিবর্তনই নতুন প্রজাতি তৈরীতে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। অতএব কিমুরার মতবাদকে ডারউইন ওয়ালেসের মতবাদের সাথে একত্র করে ভাবলে প্রজাতি থেকে প্রজাতির উদ্ভবকে বেশ ভালভাবেই শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানো সম্ভব। কিন্তু জেনেটিক মিউটেশন ঘটার পেছনে কারণটা কী তা এই দুটি মতবাদ থেকে জানা যায় না। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যে কোন রকমের পরিবর্তনের জন্য বা একটা স্থিতাবস্থাকে ভাঙতে হলে কোন না কোন শক্তি বা এজেন্টের প্রয়োজন। জেনেটিক মিউটেশনও এর ব্যতিক্রম নয়। উল্লেখযোগ্য, জেনেটিক মিউটেশনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বা এজেন্টকে বলা হয় মিউটাজেন (Mutagen)।

মিউটাজেন সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন বিজ্ঞানী হেরম্যান মুলার[৭] (Hermanm Muller, 1927)। তিনি ড্রসোফিলার (Drosophila melanogaster) উপর এক্স রশ্মি প্রয়োগ করে গবেষণাগারে জিনে মিউটেশন ঘটাতে সক্ষম হন। মুলারের এই গবেষণা জৈব বিবর্তনকে বোঝার পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর পর আরও বিভিন্ন রকমের মিউটাজেন আবিষ্কৃত হয়। মিউটাজেনগুলির মধ্যে আয়নীকারক বিকিরণের প্রাধান্যই বেশী। বলা বাহুল্য, এক্স রশ্মিও এক ধরনের আয়নীকারক বিকিরণ। এযাবৎ আবিষ্কৃত মিউটাজেনগুলির মধ্যে কিছু রাসায়নিক মিউটাজেন থাকলেও জৈব বিবর্তনের সূচনাকালে শুধু আয়নীকারক বিকিরণসমূহকেই বিবেচনা করা সম্ভব, যেহেতু রাসায়নিক মিউটাজেনগুলি প্রায় প্রত্যেকটিই

মানুষের হাতে সংশ্লেষিত।

মুলারের আবিষ্কারের সময়ও জিনবিদ্যা আজকের মত এত উন্নত ছিল না। ক্রমশ জিনবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে জিনের উপর বিভিন্ন ধরনের আয়নীকারক বিকিরণ— যথা অতিবেগুনী, এক্স রশ্মি ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রভৃতির প্রভাব নিয়ে আরও অনেক গবেষণা হয়েছে এবং দেখা গেছে জিনের সঙ্গে সরাসরি প্রতিক্রিয়ার সুযোগ পেলে যে কোন মাত্রার আয়নীকারক বিকিরণের জন্যই মিউটেশন ঘটতে পারে। অবশ্য সব সময় সব ক্ষেত্রেই যে কোন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটবে— এমনটা নাও হতে পারে। যাই হোক, মুলারের গবেষণার সূত্র ধরে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে প্রাণের প্রকাশের পর তার পরবর্তী জৈব বিবর্তনে আয়নীকারক বিকিরণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

350 কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর উপর শক্তিশালী আয়নীকারক বিকিরণের বলয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে। এই বলয়ের সংস্পর্শে যেমন রাসায়নিক বিবর্তন এবং প্রাণের প্রকাশ ঘটেছে তেমনি ইউক্যারিওটিক কোষ পর্যন্ত জৈব বিবর্তনে এই বলয়ের ভূমিকাকে অনুমান করা শক্ত নয়। সরল প্রাণপদার্থ থেকে ইউক্যারিওটিক এককোষী জীব পর্যন্ত প্রতিরূপ গঠন ও বিপাক প্রক্রিয়ার সংগঠন একই প্রাণ সংগঠনে ঘটত। এই কারণে আয়নীকারক বিকিরণ থেকে খুব সহজেই এইসব প্রাণ সংগঠনগুলির DNA অণু প্রয়োজনীয় শক্তি গ্রহণ করতে পারত এবং তার ফলে জেনেটিক মিউটেশন ঘটত। ব্যতিক্রম শুরু হয়েছিল সালোকসংশ্লেষ-যৌগের (ক্লোরোফিল) বিবর্তনের পরে। প্রাথমিকভাবে এই যৌগ বিবর্তনের পর যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি শুরু হোল তা জীবজগতের নিজস্ব খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা। এরপর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেনের অনুপ্রবেশ। দুটি পরিবর্তনই পরিপূর্ণ আকারে রূপ পেতে সুদীর্ঘকাল সময় লেগেছে। প্রথমে অবশ্যই এক কোষীয় বা অব-কোষীয় (sub-cellular) জীবে ক্লোরোফিলের বিবর্তন ঘটেছিল এবং সেই অবস্থান থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অবশ্যই সারা পৃথিবীজুড়ে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের প্রাচুর্য তৈরী হয়নি। আবার এই অক্সিজেন থেকে বায়ুমণ্ডলের আরও ওপরে ওজোন[৪] স্তর তৈরী হতে আরও দীর্ঘ সময় লেগেছে। এই সমস্ত প্রক্রিয়াটি সুদীর্ঘকাল ধরে চলেছে। এই সময়ের মধ্যে জৈব বিবর্তন প্রক্রিয়া থেমে ছিল না ঠিকই, কিন্তু বিবর্তনের হার পূর্বের তুলনায় খুব বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল— এটাও সম্ভবত নয়। তবে এই প্রক্রিয়াটি পরিপূর্ণ আকার গ্রহণ করার পর যে বিবর্তনের হার খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল তা বিভিন্ন সমীক্ষা ও অনুসন্ধানমূলক গবেষণায় প্রমাণিত। বলা বাহুল্য, বহুকোষী উচ্চতর জীবের বিবর্তন এই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল।

বায়ুমণ্ডলে ব্যাপক পরিমাণে অক্সিজেনের অনুপ্রবেশ এবং তার পরবর্তীতে ওজোন স্তরের বিকাশের ফলে কার্যত বিবর্তনের হার ক্রমহ্রাসমান হওয়ার কথা। একদিকে মহাজাগতিক রশ্মির পথ রুদ্ধ, অন্যদিকে অল্পমাত্রায় হলেও অর্ধায়ুর নিয়মে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হ্রাস পেয়েছে। এক ধাক্কায় আয়নীকারক বিকিরণের বলয় তার শক্তি হারিয়ে অর্ধেকেরও কম পরিমাণে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়ত জীবজগতের একটি অন্তর্নিহিত সমস্যা বেশ উল্লেখযোগ্য। জীব প্রজাতি

এককোষী সংগঠন থেকে বহুকোষী সংগঠনে উন্নীত হয়েছে। প্রতিরূপ গঠনের জন্য নির্দিষ্ট জনন কোষ এই সব উচ্চতর প্রজাতিতে নির্দিষ্ট এবং সংখ্যা ও পরিসরে সমগ্র দেহের তুলনায় খুবই কম। অতএব পূর্বের তুলনায় আয়নীকারক বিকিরণের সাথে প্রতিক্রিয়া একেবারেই স্বতঃস্ফূর্ত নয়, সহজও নয়। এত সব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেন এবং ওজোন স্তর বিকাশের পর জৈব বিবর্তনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উন্নত বৈশিষ্ট্যসহ জীব প্রজাতির বিবর্তন ঘটেছে। এক্ষেত্রে কী ধরনের মিউটাজেন জেনেটিক মিউটেশন ঘটাতে পারে তা অবশ্যই জটিল প্রশ্ন। সংশ্লেষিত রাসায়নিক মিউটাজেনের বিষয়টি আগেই বাতিল হয়ে গেছে। অতএব তখনকার প্রকৃতি-পরিবেশেও আয়নীকারক বিকিরণ ছাড়া অন্য কিছু সম্ভব নয়।

অক্সিজেন ও ওজোন স্তর বিকাশের আগে পৃথিবীর উপর যে মহাজাগতিক বিকিরণ আছড়ে পড়ত তার মধ্যে নিয়মিতভাবে নিউট্রন কণার প্রবাহ থাকত। উচ্চতর আবহমণ্ডলে এখনও অতি অল্প পরিমাণে নিউট্রন কণার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। নিউট্রন কণিকা মৌলান্তর প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সময়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে সে সময়ে আবহমণ্ডলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নাইট্রোজেন ও নাইট্রোজেন অক্সাইডের অস্তিত্ব ছিল। নিউট্রন কণা নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রিনে আঘাত করে কেন্দ্রিনের গঠনগত পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম এবং এর ফলে কার্বন-14 নামে একটি আইসোটোপ[৭] তৈরী হয় যা বেশ তেজস্ক্রিয়। কার্বন-14 পরমাণু আবার ঋণাত্মক β কণিকা পরিত্যাগ করে নাইট্রোজেন পরমাণুতে পরিণত হয় এবং এর ফলে 0.155 Mev শক্তি[10] নির্গত হয়। কার্বন-14 এর অর্ধায়ু 5730 বছর। অর্ধায়ু এত দীর্ঘ হওয়ার জন্য এর স্থায়িত্ব বেশ ভালই।

অতএব আলোচ্য সময়কালে আবহণ্ডলে যে কার্বন-ডাই অক্সাইডের অস্তিত্ব ছিল তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কার্বন-14 পরমাণু দ্বারা গঠিত ছিল এরকম অনুমানে বাধা থাকার কথা নয়। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরেও পৃথিবীর চারিদিকে উচ্চ আবহমণ্ডলে ওজোনের আবরণ তৈরী হতে দীর্ঘ সময় লেগেছে এবং এই সময় জুড়েও উপরোক্ত কেন্দ্রিন বিক্রিয়া চলেছে এবং সব মিলিয়ে আবহমণ্ডলে কার্বন-14 পরমাণুর যথেষ্ট প্রাচুর্য ছিল।

সালোকসংশ্লেষ-যৌগের বিবর্তনের পর বায়ুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রথমে সবুজ উদ্ভিদে অনুপ্রবেশ শুরু করল। তারপর খাদ্য শৃঙ্খলের (food chain) মাধ্যমে আস্তে আস্তে জীবজগতের অধিকাংশ প্রজাতিতে ছড়িয়ে পড়ল। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মধ্যে কার্বন-14 পরমাণু দিয়ে গঠিত অসংখ্য অণু থাকবে এটাই স্বাভাবিক। অতএব বিভিন্ন প্রজাতির জনন কোষের DNA অণুতেও কার্বন-14 পরমাণুর অস্তিত্ব নিয়ে কোন সংশয়ের প্রশ্ন থাকে না। একটি DNA অণুতে কী সংখ্যায় কার্বন-14 পরমাণু থাকতে পারে তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কার্বন-14 পরমাণু তৈরী হওয়া থেকে শুরু করে DNA অণুতে আশ্রয় লাভ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটিই এলোপাথাড়ি (random)। একটি DNA অণুর প্রতিটি নিউক্লিওটাইডে 10 টি করে কার্বন পরমাণু থাকে। একমাত্র সাইটোসাইন ক্ষার যুক্ত নিউক্লিওটাইডে 9টি কার্বন

পরমাণু থাকে। এলোপাথাড়ি প্রক্রিয়ার জন্য কোন নিউক্লিওটাইডে একটিও কার্বন-14 পরমাণু থাকতে পারে, কোনটিতে 9টি/10 টিও থাকতে পারে, অথবা কোনটিতে একেবারে নাও থাকতে পারে। একটি DNA অণুতে নিউক্লিওটাইড জোড়ার সংখ্যা অনেক। অতএব যে কোন মুহূর্তে একটি DNA অণুতে হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ কার্বন পরমাণুর মধ্যে কয়েকশ বা কয়েক হাজার কার্বন-14 পরমাণুর অস্তিত্বকে নাকচ করা সম্ভব নয়। একইভাবে পুরো জেনমে কয়েক কোটি কার্বন পরমাণুর মধ্যে এক/আধ লক্ষ কার্বন-14 পরমাণুর অস্তিত্বের সম্ভাব্যতাকে নাকচ করাও সম্ভব নয়।

একটি কোষের আয়তন এতই ছোট যে শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ ছাড়া তা দেখা যায় না। কোষের ভিতর নিউক্লিয়াস, কোষের আয়তনের তুলনায় আরও ছোট। তার উপর নিউক্লিয়াসের মধ্যে জেনমের আয়তন সাধারণ মাপে অনুমান করাই শক্ত। এরকম এক অতি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে যদি কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ কার্বন-14 পরমাণু থাকে তাহলে এর থেকে যে তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ নির্গত হবে তা অতি ক্ষুদ্র আয়তনের জেনমকে অতি সহজে স্পর্শ করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি এটাও উল্লেখযোগ্য যে সব কার্বন-14 পরমাণু একসঙ্গে ভাঙবে না এবং তেজষ্ক্রিয় বিকিরণও হবে না। কিন্তু সব কার্বন-14 পরমাণুকেই কোন না কোন সময় ভাঙনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। প্রশ্নটা শুধু সময়ের। ফলত, আলোচ্য সময়ে পৃথিবীর উপর যেসব জীব প্রজাতির অস্তিত্ব ছিল তাদের জনন কোষের জেনমে কার্বন-14 পরমাণু থেকে নির্গত আয়নীকারক বিকিরণ যে প্রতিক্রিয়া ঘটাত সে বিষয়ে খুব একটা সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। অতএব এর ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেনেটিক মিউটেশনও ঘটত।

কার্বন-14 পরমাণু ছাড়া আরও কিছু তেজষ্ক্রিয় মৌল রয়েছে যেগুলি জীব-কোষের সংগঠক উপাদান। এগুলি কোটি কোটি বছর আগে তো ছিলই, এখনও কিছু রয়েছে। যেমন এখনও সাধারণ পটাশিয়ামের সাথে প্রায় 0.0118 শতাংশ পটাশিয়াম-40 মিশে রয়েছে। পটাশিয়াম-40 একটি তেজষ্ক্রিয় মৌল যা থেকে β কণা নির্গত হয়। এর অর্ধায়ু 1.26×10^9 বছর। অতএব যে সব জীবকোষে সংগঠক উপাদান হিসাবে পটাশিয়াম রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে ন্যূনতম 0.0118 শতাংশ পটাশিয়াম-40 থাকার সম্ভাবনা। অর্ধায়ু অনেক বেশী হওয়ার জন্য এর বিঘটন হার খুব ধীর। পটাশিয়াম-40 এর মত জীবকোষের সংগঠক অনেক মৌলের তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ আছে যেগুলির দু'একটিকে (আয়রণ, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি) বাদ দিলে প্রত্যেকের অর্ধায়ু সেকেন্ডে, মিনিটে অথবা ঘন্টায়। আলোচ্য সময়ে জীবকোষে এদের অস্তিত্ব কল্পনায় আনা খুবই দুরূহ। দ্বিতীয়ত, এরা কেউই DNA এর সংগঠক মৌল নয়। তৃতীয়ত, কার্বন-14 এর মত প্রাচুর্যও এদের নেই। সম্ভাব্যতার নিয়মে কখনও কদাচ দু'একটি তেজষ্ক্রিয় পরমাণু যদি জীবকোষে আশ্রয় পেয়ে যায় তাহলেও তা জননকোষে জেনেটিক মিউটেশন ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট হিসাবে কল্পনা করা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, কখনও কোন কারণে যদি এই তেজষ্ক্রিয় মৌল সংগঠক উপাদান হিসেবে জীবকোষে প্রচুর পরিমাণে অনুপ্রবেশের সুযোগ পায় তাহলে জিনঘটিত পরিবর্তন ঘটবে না— একথা বলা যায় না।

অতএব সালোসংশ্লেষ-যৌগের বিবর্তনের পর উচ্চতর জীবনের বিবর্তনে কার্বন14 এর ভূমিকা সবগুলি দিক থেকেই প্রশ্নাতীত। এর অর্ধায়ু খুব বেশীও নয়, খুব কমও নয় এবং এর নিয়মিত উৎপাদনের একটা ব্যবস্থা ছিল। এই সুবিধাগুলি না থাকলে কার্বন-14 যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হত না। যাই হোক, যত সময় গিয়েছে ততই কার্বন-14 পরমাণু ক্রমশ নাইট্রোজেন পরমাণুতে পরিবর্তিত হয়েছে। বিবর্তনের হারও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পেয়েছে। আক্ষরিকভাবে এটা বলা যাবে না যে জৈব বিবর্তনের হার শূন্যতে নেমে গেছে। তবে বর্তমান পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক গঠন সহ সামগ্রিক জৈব বৈচিত্র্য অনেক সুস্থির (stable)। এর সব চাইতে বড় কারণ, পৃথিবীর উপরিতলে প্রাকৃতিক আয়নীকারক বিকিরণের পরিমাণ একেবারে শূন্য না হলেও তার অনেক কাছে। এমতাবস্থায় প্রাকৃতিক কারণে ইতিবাচক জৈব বিবর্তনের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

প্রাণের বিকাশ ও পরবর্তী বিবর্তনে আয়নীকারক বিকিরণ ছাড়া আরও অনেক কিছুরই ভূমিকা রয়েছে। তবে আয়নীকারক বিকিরণের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন পর্যায়ে এই বিকিরণ বিভিন্নভাবে তার ভূমিকা পালন করেছে। প্রাণের প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আয়নীকারক বিকিরণের ভূমিকা ছিল পরিপূর্ণ সদর্থক বা ইতিবাচক। বাস্তবিক, এই বিকিরণ ছাড়া প্রাণের প্রকাশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ সংঘটিত হতে পারত না। কিন্তু পরবর্তী জৈব বিবর্তনে এর ভূমিকা ছিল একই সঙ্গে ইতিবাচক ও নেতিবাচক। এই পর্বে জেনেটিক মিউটেশন নতুন প্রজাতির উদ্ভবকে যেমন সহযোগিতা করত, তেমন অনেক সময় জেনেটিক মিউটেশন কালান্তক (lethal mutation) হোত। এই ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকার টানাপোড়েনে একদিকে ক্রমোন্নত ভূ-তাত্ত্বিক সুস্থিতির (stablity) সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জৈব বৈচিত্র্য ক্রমশ বিকাশ লাভ করেছে, অন্যদিকে আয়নীকারক বিকিরণের পরিমাণও ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করেছে। বলা যেতে পারে, জীবজগতের সুস্থিতি আয়নীকারক বিকিরণের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কে আবদ্ধ। অতএব তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ বর্তমানে সামগ্রিক জীবজগতের পরিপ্রেক্ষিতে আয়নীকারক বিকিরণের ভূমিকা পরিপূর্ণভাবে নেতিবাচক। বর্তমানে যে কোন মিউটেশন মানেই সংশ্লিষ্ট জীবপ্রজাতির সদস্যদের সুস্থিতি নষ্ট করা। সুদীর্ঘকাল সুস্থির অবস্থায় থাকার জন্য প্রায় প্রত্যেক প্রজাতিই প্রকৃতির সঙ্গে এমন এক অনুকূল সম্পর্কের ভিত্তিতে টিকে আছে যে বেশিরভাগ মিউটেশন তথা পরিবর্তনই এই সম্পর্কের পরিপন্থী এবং সংশ্লিষ্ট জীব প্রজাতির অস্তিত্বের পক্ষে প্রতিকূল।

1927 সালে হেরম্যান মুলার যখন ড্রসোফিলার উপর এক্স রশ্মি প্রয়োগে মিউটেশন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন তখন তার মাত্রা ছিল 34 Sv. যা অনেক তীব্র। এরপর আরও অনেক পরীক্ষা হয়েছিল জিনগত পরিবর্তন বোঝার জন্য। ড্রসোফিলার উপর ক্রমাগত নিম্নমাত্রার বিকিরণ প্রয়োগ করে পরিষ্কার বোঝা গেছে, যে কোনরকম নির্দিষ্ট নিম্নমাত্রার

বিকিরণ সীমা (threshold) ছাড়াই আবিষ্ট মিউটেশনের সংখ্যা ক্রমাগত নিম্ন থেকে নিম্নতর মাত্রার বিকিরণের সঙ্গে সমানুপাতিক। 1930 সালে বিকিরণের মাত্রা ক্রমশ হ্রাস করতে করতে 3 Sv.[11] পর্যন্ত বিকিরণের সঙ্গে সন্তান সন্ততির মধ্যে মিউটেশন প্রকাশের হারকে সমানুপাতিক হতে দেখা গেছে। এই মাত্রা 1949 সালে 0.25 Sv. এবং 1961 সালে 0.05 Sv.। বিকিরণের এই মাত্রাগুলি বর্তমানে সব রকমের প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত মোট বার্ষিক বিকিরণ 0.001 Sv. বা এক মিলি Sv. বিকিরণের চাইতে এখনও অনেক বেশী। উদ্ভিদের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, এই বিকিরণের মাত্রা অনেক কম। স্পাইডারওয়ার্ট নামে এক প্রকার উদ্ভিদের উপর পরীক্ষায় এই বিকিরণের মাত্রা পাওয়া গেছে মাত্র তিন মিলি. Sv.। অতএব জীবজগতে আয়নীকারক বিকিরণের কোন ন্যূনতম সহনযোগ্য মাত্রা থাকতে পারে— এরকম ধারণার উপর আস্থা রাখা একেবারেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ যে কোন মাত্রার এই বিকিরণই জীবজগতের পক্ষে ক্ষতিকর। জীবজগৎ এখন যথেষ্ট সুস্থির। তার উপর পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থানও পূর্বাপেক্ষা অনেক সুস্থির। তথাপি প্রাকৃতিক উৎস থেকে যে ন্যূনতম মানের বিকিরণটুকু (বার্ষিক 0.001 Sv) এখনও জীবজগতকে ভোগ করতে হয় তাও প্রজাতিসমূহকে খুব অল্প হলেও অস্বস্তির মধ্যে রাখে। মানুষের মধ্যে এখনও গড়ে দেড় শতাংশ শিশু মিউটেশনের কারণে বিকৃতি (abnormalities) সহ জন্মায়। এছাড়া দেহকোষে আয়নীকারক বিকিরণের প্রভাবে ঘটে ক্যান্সার ও লিউকেমিয়া— দুটি নিয়মিত প্রাণঘাতী রোগ।

উপসংহার

পাহাড়-পর্বত, মালভূমি, ভূ-ত্বকের উপর নরম মাটির আস্তরণ, ভূ-ত্বক থেকে স্বল্প গভীরে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, ভূ-গর্ভস্থ জল, নদ-নদী, সাগর, মহাসাগর, আন্তর্দেশীয় সাগর-হ্রদ, বায়ুমণ্ডল, ওজোন স্তর ইত্যাদি প্রত্যেকটিই এক একটি বস্তু সংগঠন। জীব জগতে ঠিক যেমন প্রতিটি প্রজাতি এক একটি জীবন সংগঠন। এইসব বস্তু সংগঠনের গঠনগত উপাদানগুলি শুরু থেকেই পৃথিবীতে থাকলেও প্রতিটি বস্তু সংগঠন তার নির্দিষ্ট অবস্থানগত চরিত্র অর্জন করেছে সুদীর্ঘকাল ধরে ধাপে ধাপে বিভিন্ন ভৌত-রাসায়নিক তথা জৈব-ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ, প্রতিটি প্রাকৃতিক উৎস তথা বস্তু সংগঠনের একটা নির্দিষ্ট বাস্তু-ভূ-তাত্ত্বিক পথ (geo-ecologic route) আছে, যে পথের বিভিন্ন বিন্দুতে উক্ত বস্তু সংগঠনের এক বা একাধিক বাস্তুতান্ত্রিক দায়িত্ব (ecological responsibility বা সংক্ষেপে ER) তৈরী হয়েছে। কোন বস্তু সংগঠনের অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের সামান্যতম বিচ্যুতির অর্থই হল তার ER লুপ্ত হওয়া। এতে বস্তুজগতের কিছু এসে যায় না। একটি বস্তু সংগঠনের

অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য খেপে খেপে নতুন ER সহ নতুন বস্তু সংগঠন তৈরী হয়। কিন্তু মানুষ তথা জীবজগতের সামনে সংকট তৈরী হয়, যেহেতু তাদের অভিযোজনগুলি তৈরী হয়েছে পূর্বতন বস্তু সংগঠনের ER এর সাথে সাযুজ্য বজায় রেখে। প্রাকৃতিক কারণে যদি কোন বস্তু সংগঠনের অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় তাহলে অবশ্যই বিশেষ কিছু করার থাকে না। কিন্তু গত তিনশ বছর ধরে মানুষ নিজেই অসংখ্য বস্তু সংগঠনের অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট করেছে, যার ফলস্বরূপ ক্রমাগত পরিবেশ বিপর্যয় এই মুহূর্তে মানুষের কাছে সব চাইতে বড় সমস্যা। এর অর্থ অবশ্যই এই নয় যে মানুষ তার সভ্যতা বিকাশের স্বার্থে কোন প্রাকৃতিক উৎস ব্যবহার করতে পারবে না। প্রাকৃতিক উৎস অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু তার ER কে সংরক্ষণ (restore) করে। যদি কোন প্রাকৃতিক উৎসের ER এর সংরক্ষণ নিশ্চিত করে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটান সম্ভব না হয় তাহলে সেই উৎস ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। গত তিনশ বছর ধরে প্রযুক্তির গবেষণা ও বিকাশে কখনই এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হয়নি। আয়নীকারক বিকিরণের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

পৃথিবীতে জীবজগতের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আয়নীকারক বিকিরণের ER তিনটি পর্যায়ে তিন রকম। প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ শুরু থেকে অন্তত 150 কোটি বছর পর্যন্ত এর ভূমিকা ছিল ইতিবাচক। সে সময় পৃথিবীর উপর পর্যন্ত আয়নীকারক বিকিরণের উপস্থিতি না থাকলে প্রাণের প্রকাশ সম্ভব হত না। দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ প্রাণের প্রকাশের পর জৈব বিবর্তনে এর ভূমিকা একই সাথে ইতিবাচক ও নেতিবাচক। একদিকে প্রজাতির বিবর্তন ঘটেছে, অন্যদিকে প্রজাতির অবলুপ্তি ঘটেছে। এরকম ভাঙা-গড়া চলতে চলতে কোন এক সময় বিবর্তিত প্রজাতি ও অবলুপ্ত প্রজাতির অনুপাত আয়নীকারক বিকিরণের সাথে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল, অর্থাৎ আয়নীকারক বিকিরণের মাত্রা যত হ্রাস পেয়েছে জীবজগৎ তত স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে। আয়নীকারক বিকিরণের ক্রমহ্রাসমান মাত্রার দুটি কারণ। প্রথমত, ওজোন স্তর তৈরী হওয়ার পর সৌর ও মহাজাগতিক বিকিরণের আগমন অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, অর্ধায়ুর নিয়মে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তথা মৌলগুলির পরিমাণও ক্রমহ্রাসমান। বস্তুত এই দুটি কারণের জন্যই প্রাকৃতিক বিকিরণের (background radiation) বার্ষিক মাত্রা 0.001Sv. সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়েছে। পরমাণু অস্ত্র ও পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে খনিজ তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার থেকে বহুগুণিতক হারে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিতে উপরোক্ত ER সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাও নেই, সুযোগও নেই। পাশাপাশি শিল্পজাত নানা দূষক পদার্থের জন্য ওজোন স্তরও ক্রমশ পাতলা হতে শুরু করেছে। অতএব আগামী দিনে আয়নীকারক বিকিরণের মাত্রা 0.001Sv. থেকে নিম্নমুখী হওয়ার পরিবর্তে ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করবে এবং মানুষ তথা জীবজগৎ আরও সুস্থিতি লাভের পরিবর্তে অস্থির অবস্থার সম্মুখীন হবে। অস্তিত্বের সংকটও দেখা দিতে পারে।

টীকা :

1. The Origin of Life by Natural Causes, M. G. Rutten, 1971, পৃষ্ঠা - 60
2. জৈব বিবর্তনের পথে প্রোক্যারিওটিক কোষের স্থান ব্যাকটিরিয়ার পরে।
3. জৈব বিবর্তনের পথে ইউক্যারিওটিক কোষের স্থান প্রোক্যারিওটিক কোষের পরে।
4. যে কোন তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে α, β ও γ এই তিনটি রশ্মির বিকিরণ ঘটে। বিকিরণের ফলে কখনও পরমাণুর ভরসংখ্যা বা কখনও পরমাণু সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। এইভাবে কোন তেজস্ক্রিয় মৌলের পরিমাণ স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণ বা বিঘটনের মধ্য দিয়ে যে সময়ে অর্ধেক ভরে পরিণত হয় সেই সময়কে ওই তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু বা half life বলে।
5. গ্রেগর মেন্ডেল ছিলেন অষ্ট্রিয়ার অগাস্টিনিয়াম মনাস্টারিতে একজন প্রিস্ট। তিনি তাঁর বংশগতি সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি প্রথম পাঠ করেন History Society of Brünn এর দুটি সভায় 1865 সালে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে 1866 সালে গবেষণাপত্রটি পাঠানো হয়। কিন্তু 1900 সাল পর্যন্ত গবেষণাপত্রটি ছিল অবহেলিত। এই সময়ের মধ্যে যাঁরা এই গবেষণাপত্রটি পড়েছেন তাঁরা কেউই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি। 1900 সালে প্রায় একই সময়ে হল্যান্ডে De Vries, জার্মানীতে Correns এবং অষ্ট্রিয়াতে Tshermak গবেষণার মাধ্যমে মেন্ডেলের সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তাঁরা বিস্মৃত মেন্ডেলকে আবিষ্কার করেন।
6. The Natural (Neutral) Theory of Molecular Evolution, Motto Kimura, পৃষ্ঠা 25 ও 34.
7. Nuclear Radiation : Risks & Benefits, Pochin Edward, পৃষ্ঠা 109
8. ওজোন অক্সিজেনের একটি বহুরূপ (allotrope)। তিনটি অক্সিজেন পরমাণু-সহযোগে একটি ওজোন অণু তৈরী হয়। মহাজাগতিক রশ্মির সাথে আগত অতিবেগুনী রশ্মির আগমনকে বাধা দেয়। বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরটি ওজোন দিয়ে তৈরী এবং এই স্তরটি বলয়াকারে পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে।
9. একই মৌলের যে কোন পরমাণুতে একই সংখ্যক প্রোটন থাকে, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে। একই প্রোটন সংখ্যা তথা পরমাণু সংখ্যা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভরসংখ্যা যুক্ত (বিভিন্ন নিউট্রন সংখ্যার কারণে) পরমাণুকে কোন মৌলের আইসোটোপ বলে।
10. Mev বা মিলিয়ন ইলেক্ট্রন ভোল্ট। ক্ষুদ্রতরঙ্গের শক্তির পরিমাপের একক ইলেক্ট্রন ভোল্ট।
11. Sv বা সিভার্ট আয়নীকারক বিকিরণ পরিমাপের একক।

গ্রন্থপঞ্জী :

Heirich D. Holland – 'On the Chemical Evolution of the Terrestrial & Cytherean Atmospheres' form The Origin of Atmosphere and Ocean, edited by Peter J. Brancajio and A.G.W. Cameron, New york, 1964.

Barkner, L. V & Mershall, L.C. – 'The History of Growth of Oxygen in the Earth's Atmosphere' from The Origin of Atmosphere and Ocean, edited by Peter J. Brancajio and A. G. W. Cameron, New york, 1964

Rubey W. William – 'Geologic History of Sea water' from The Origin of Atmosphere and ocean, edited by Peter J. Brancajio & A. G. W Cameron, New york, 1964.